International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

।।বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকঃ একটি নবতর সমীক্ষা।।

ডঃ সুশান্ত ঘোষ

কোলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstact:
Bibhuti Bhushan Bondyopadhyaya was a great novelist and short stories writer in modern Bengali literature. After Rabindranath Tagore Bibhuti Bhushan one of the most popular author amongst Three Bondyopadhyaya. He was not only novelist, he composed wonderful literature for children and as well as he was an essay writer in Bengali literature. Pather Panchali was a milestone work .He was a nature lover and he discovered humanity and purity from each and everywhere. Aranyak, a milestone novel in his literary life. He was a worshipper of nature and human being of Labtulia Jungle in Bihar. He discovered the sons of the nature in this jungle and he sacrificed his life for them.

Keyword: Humanity, Nature, wildlife, conflict, literature

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসটি একটি ভিন্নস্বাদের ব্যতিক্রমী উপন্যাস। উপন্যাসটি মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'আরণ্যক' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'কাত্যায়নী বুক স্টল' থেকে।

উপন্যাসটি রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে দেখা যায় এর পটভূমি বাংলার বাইরে বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলের লবটুলিয়া বইহারের সুবিস্তৃত অরণ্য পরিবেশ ও সেখানকার মানুষের বৈচিত্র্য। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে সূচনায় একটি 'প্রস্তাবনা' রচনা করেছে অতীত স্মৃতিচারণার সূত্রে তাঁর বিহার প্রবাসের দিনগুলির চিত্র ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের কথক সত্যচরণ আসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিরূপ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ সালে পাথুরিয়াঘাটার জমিদার অক্ষয় ঘোষের জমিদারী এস্টেটের বিস্তৃত অংশ তদারকীর জন্য বিহারের ভাগলপুরে যাত্রা করেন। সেখানকার আরণ্যক পরিবেশে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। আর 'আরণ্যক' উপন্যাসটির রচনা কাল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ। প্রকৃতপক্ষে 'আরণ্যক' উপন্যাসটি রচনার সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ভাগলপুরে বসবাসের অভিজ্ঞতাই বর্ণময় হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। প্রকৃতির কোলে 'আদিম প্রাণের বন্দনা' প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসে। 'প্রস্তাবনা' অংশে তিনি বলেছেন- "কলিকাতা শহরের হৈ চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কী আজমাবাদের সে অরণ্য ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূ ধূ ঝাউ আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূশর শৈল শ্রেণী, গভীররাত্রে বন্য নীল গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে স্বরস্বতীকুন্ডীর জলে ধারে পিপাসার্ত বন্যমহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তূপ প্রান্তরে রঙিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্ত পলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোনো অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যার ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।" এই 'সৌন্দর্যভরা জগতের' কথাই আরণ্যক উপন্যাসের প্রতিবেশ তৈরি করেছে। আবার এই প্রস্তাবনাতেই তিনি কুস্তা, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে প্রভৃতি চরিত্রগুলির নামও স্মরণ করেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের পরিবেশ ও চরিত্র সবই লেখকের অভিজ্ঞতার সুবিন্যস্ত ফসল। উপন্যাসটির মূল সুরও যে বেদনার সেকথাও প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন- "কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয় দুঃখের।" সমগ্র উপন্যাসটি জুড়েই রয়েছে প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় নৈকট্য ও এক ধরনের শান্ত করুণ রস।

উপন্যাসটি আঠারোটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কলকাতার নাগরিক পরিবেশে শিক্ষিত সত্যচরণ কর্মপোলক্ষে বিহারের লবটুলিয়া জঙ্গ লে এসে হাজির হয়েছেন। শহরের কর্মব্যস্ত পরিবেশ থেকে অরণ্য পরিবেশে এসে মানিয় নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু

প্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য তাঁকে মাতোয়ারা করে তোলে। জঙ্গলই হয়ে ওঠে সত্যচরণের ভালোবাসা। এখানেই পাটোয়ারি, কটু মিশ্রের মতো আদি প্রাণের প্রকৃতি সন্তানদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। গনোরি তেওয়ারী, গনু মাহাতোর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার সঙ্গে সত্যচরণের সাক্ষাৎ। তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া বিপুল অভিজ্ঞতার কথা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। নীলগাই, হায়েনা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তুদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় নৈকট্য। সত্যচরণের উপলব্ধি, প্রকৃতি মুগ্ধতা এক অরণ্যসুন্দর ভাবাবেগে প্রকাশিত হয়েছে 'দাবানলের প্রকোপে বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় মানুষজনদের অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার কথাও এই পরিচ্ছেদে স্থান লাভ করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে কাছারির 'পুণ্যাহ' উৎসব উপলক্ষে উৎসবের আনন্দকে কেন্দ্র করে বিচিত্র স্বভাবের প্রকৃতি সন্তানদের উপস্থিতি তাদের আচরণ এখানে রচিত হয়েছে। এখানেই 'বিশুয়া' নামক দরিদ্র সন্তান, দোষাদ স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করেছেন। ধাওতাল সাহুর মতো মহাজন, জয়পালের মতো নির্জন ভাবুক, নিস্পৃহ মানুষ এখানে জীবন্ত চরিত্র প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে লবটুলিয়া কাছারিতে কুন্তার আগমন, তার হতদারিদ্র লাঞ্ছিত অসহায় জীবনযাত্রার সকরুণ রূপটি যথাযথভাবে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। গিরিধারীলালের মতো মানুষের সাক্ষাৎ পাই এই পরিচ্ছেদে। এখানেই ছককরবাজি নামক আঞ্চলিক নাচ, ধাতুরিয়ার মতো নাচিয়ের আবির্ভাব ঘটে এই পরিচ্ছেদেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আরণ্যক পরিবেশে অত্যাশ্চর্য অলৌকিক পরিদের ঘটনা রামচন্দ্র আমিন ও আশরফি টিন্ডেলের কথায় অভাবনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে রূপকথার ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সূত্রে। এই পরিচ্ছেদেই রাজু পাঁড়ের মতো বহুগুণান্বিত পরোপকারী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদে পূরণচাঁদ টিন্ডেল এর 'দয়া হোইজি" গান প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে 'রাসবিহারী সিং রাজপুত এর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা ও আতিথেয়থা ধাতুরিয়ার শিল্পী স্বভাবের ইচ্ছার কথা স্থান পেয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রবাসী বাঙালি ডাক্তার রাখালবাবুর পরিবারের অসহায় অবস্থার চিত্র, সরস্বতী কুণ্ডির পরিচয় ও তার নৈসর্গিক দৃশ্যলোক, যুগলপ্রসাদের কথা তার অরণ্যপ্রীতি, সৌন্দর্যবোধের অত্যাশ্চর্য চিত্র উদঘাটিত হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদে মটুকনাথ পাঁড়ে, তাঁর টোল, গাঙ্গোতা ও রাজপুত সংঘর্ষ ও নাড়া বইহারের অনুপম প্রকৃতির মুগ্ধ সৌন্দর্য এই পরিচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদেই প্রথম সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বুনো মহিষের দেবতা 'টাড়বারো' এর কথা উল্লিখিত হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদে মানুষখেকো বাঘের কাহিনি। দরিদ্র কাটুনি মজুরদের বিচিত্র অসহায় জীবনযাত্রা, নকছেদী ভগতের কথা, মঞ্চীর দারিদ্রা লাঞ্ছিত জীবনযাত্রা, ফুলকিয়া বইহারের মেলা, ননীচোর নাটুয়ার নাচ' প্রভৃতি বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে সাঁওতাল রাজা দোবরুপান্না, ভানুমতী, জগরু পান্না, তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস, ভানুমতী, সত্যচরণের অস্ফুট অস্পষ্ট ভালোবাসা, টাড়বারোর বিস্তৃত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রাজু পাঁড়ের প্রেমের রোমান্টিক স্মৃতিচারণা। গোঁড় পরিবারের দারিদ্র, অসহায় জীবনযাত্রা, সন্ন্যাসীর আগমন কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ এর আবির্ভাব এই পরিচ্ছেদটিকে অপূর্ব স্বাদে বৈচিত্রমণ্ডিত করেছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মঞ্চীর কথা, ভানুমতীর সঙ্গে সত্যচরণের নৈকট্য, আতিথেয়তা, ঝুলনোৎসবের আনন্দ, ভানুমতীর আয়নার মতো তুচ্ছ জিনিসের আকাঙ্খা এই পরিচ্ছেদে অপূর্ব শিল্পসৌকর্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলে আগত শহরের বাবুদের অস্বাভাবিক আচরণ জুয়াচোর ধরার কাহিনি, মঞ্চীর নিরুদ্দেশ হবার কথা, ভানুমতীর জ্যাঠামশাই দোবরুপান্নার মৃত্যু, ভানুমতীর কর্তব্যবোধ অসম্ভব রূপ বাত্মতার সঙ্গে রচিত হয়েছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ধাওতাল সাহু মহাজনের মহৎ মানসিকতা, বাঙালি চিকিৎসক রাখালবাবুর পরিবারের সদস্যদের জীবনচর্চা ভানুমতীর বাড়িতে সত্যচরণের আগমন, ধাতুরিয়া পুনরার্বিভাব। বনপ্রকৃতির সঙ্গে অরণ্য সন্তানদের অপূর্ব টানাপোড়েনের কথা এই পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে যুগলপ্রসাদের বনসৃজনের সৌন্দর্যসৃষ্টি গনোরি তিওয়ারির প্রসঙ্গ রাজু পাঁড়ের আগমন, কুন্তার উপস্থিতি কুশল সংবাদ বিনিময় এই পরিচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে সত্যচরণের নিজ চেষ্টায় লবটুলিয়া বইহারের পরিবর্তিত করা সৌন্দর্য দর্শন, দ্রোণ মাহাতোর দেবার্চনার কথা, ছট পরবের উৎসবের বৈচিত্র্য, ঝল্লু মাহাতোর কথা, অসহায় অসুস্থ গিরিধারীলাল এর চিকিৎসা ও রাজু পাঁড়ের সেবাযত্ন এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জঙ্গলমঙ্গল পরিত্যাগ করে কলকাতায় সত্যচরণের ফিরে আসার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফিরে আসার সময় তার নিজের সৃষ্ট সভ্যতাকে ও অরণ্যের মানুষদের একে একে দর্শন করে বেদনা মিশ্রিত উপলব্ধিই এই পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিদায়ের বিষাদ করুণ আবেগ এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তিকে ভারাক্রান্ত করেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রকৃত শ্রেণি কী হতে পারে তা নিয়ে সমালোচক মহলে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও 'আরণ্যক' যে একটি সার্থক ও কালজয়ী উপন্যাসই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে কারণে 'আরণ্যক' সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই জানিয়েছেন 'এটি উপন্যাস'। প্রকৃত অর্থে উপন্যাসের প্রচলিত ধারা অনুসারে এটিকে বিচার করা সমীচীন না হলেও উপন্যাসের কাজ যে মানুষ ও প্রকৃতির আত্মস্বরূপ উদঘাটনের সবিশেষ প্রচেষ্টা সে দিক থেকে এটি উপন্যাসের মৌল বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যে কার্যকারণ সূত্র একটি উপন্যাসের সমগ্র কাহিনি ও চরিত্র শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখে সেই কার্যকারণ সূত্রের নিবিড়তাও এখন স্পষ্ট। উপন্যাসে থাকে মানব চরিত্রের টানাপোড়েন আরণ্যক উপন্যাসে বহু চরিত্রের আগমন ঘটেছে। তাদের ব্যক্তিক জীবন ও সম্পর্কের টানাপোড়েন উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে বিচিত্র লৌকিক অলৌকিক কাহিনি লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে সত্যচরণের উপলব্ধিতে একত্রে বিনিসুতোয় গাঁথা পড়েছে। এই কারণে আরণ্যক প্রকৃতই উপন্যাস গোত্রের। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে অধ্যাপক ও বিদগ্ধ সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত 'আরণ্যক' এর উপন্যাসত্ব নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন "উপন্যাস সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী সাহিত্য প্রজাতি (লিটেরারি স্পিসিস)। আরণ্যকে আছে ভ্রমণ কিঞ্চিত স্মৃতিকথন-এইসব মিলে খানিকটা আত্মজৈবনিক তো বটেই। এটি উপন্যাস, বেশ খোলামেলা ভঙ্গীর উপন্যাস-টুকরো এপিসোডের মালা, যেমনটি বিভূতির উপন্যাস হয়ে থাকে। তবুও কৈফিয়ৎ যদি দিতে হয়, কেন উপন্যাস তো বলি-(১) একটি কেন্দ্রীয় থিম আছে। যার সূত্রে বিচিত্র ও বহুল খণ্ড বৃত্তান্তের হার বানানো হয়েছে। তিনি এত ধীর গতি অনেকটা সময় নিয়ে বানান, অজস্র প্রাত্যহিক ঘটনা ও বর্ণনার প্রবাহিত করে রাখেন। যাতে সেই বানিয়ে তোলাটা ধরা যায় না। তবু কেন্দ্র খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। এই উপন্যাস হল সত্যর সঙ্গে বইহারের অরণ্য প্রকৃতির প্রেম। সত্য নিজে বাধ্য হয়েছে তার প্রেমকে হত করতে। এটি একটি অসাধারণ থিম সন্দেহ নেই, কিন্তু মানবিক ও ট্রাজিক। এই হত্যার পিছনে নিয়তির অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা অনুভব করি। (২) সত্যবাবুর দেখা শোনা ভাবা শুধু ভ্রমণকারীর পর্যবেক্ষণ নয়। কাহিনির নায়কের হৃদয়োছেলতা। ভ্রমণকারীর সহানুভূতিতে প্রীতিতে দর্শকের দূরত্ব থাকে, যে মূহূর্তে তাতে আসক্তির আবেগ লাগে, মোহের রঙ জমে তখনই সে হয়ে ওঠে গল্পের নায়ক। সত্য শুধু ভ্রমণকারী নয়। সে নায়ক। (৩) বিভূতিবাবুর উপন্যাসে যেমন থাকে অজস্র মানুষের মুখচ্ছবি, দ্বিমাত্রিকগ চরিত্র চিত্রণ, এখানেও তাই আছে। তবুও কিছু কিছু মানুষ ঘুরে ঘুরে আসে। তার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের কিছু বিকাশ বিবর্তন চোখের সামনে রূপ ধরে। পথের পাশের মানুষটির মতো একবার দেখা দিয়েই সবাই চিরকালের মতো হারিয়ে যায় না। কিছু একান্ত গৌণ নরনারী ফুরিয়ে যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সূত্রধারণ চলে। অরণ্যকেও তাই। অনেকের পরিণতি অনেকের গুরুত্বপূর্ণ,স স্বয়ং নায়ক সত্যের চরিত্র বিবর্তন, এসব এই বইয়ে ঘটেছে কারণ এটি একটি উপন্যাস।"৩

সমালোচকের এই দীর্ঘ অথচ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আরণ্যক প্রকৃতপক্ষে একটি সার্থক উপন্যাস। সত্যচরণ কর্মজীবনে বিহারের লবটুলিয়া বইহারের গহন অরণ্য পরিবেশে অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিচিত্র মানুষের পরিচয় লাভকরেছে। তাঁর সহজ সরল পদচারণা সমগ্র চরিত্রগুলিকে এক অভাবনীয় ঐক্যে একত্র করেছে। ভানুমতীর সঙ্গে তাঁর ভালোলাগার মুহূর্ত, গরীব অসহায় প্রজাদের জীবনচর্চার গভীরতম মূল্যায়ন ধরা পড়েছে। সেই মূল্যায়নই আরণ্যককে উপন্যাসের মর্যাদা দিতে পারে। সাধারণ অর্থে উপন্যাস একটি কাহিনিরই সুবিস্তৃত রূপ সেই রূপে শাখা ও উপকাহিনি মিশে এক পরিপূর্ণ কাহিনির অবয়ব রচিত হয় উপন্যাসের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে আরণ্যকের একটি নিঃখুত কাহিনির অবয়ব না থাকলেও সত্যচরণের উপলব্ধি আর প্রকৃতির নিবিড় বাঁধনে সমগ্র উপন্যাসে একটি কাহিনিই উপস্থিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ ঘটনা ও চরিত্রগুলি অবিচ্ছেদ্য ঐক্যে মিশে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম সত্যচরণের কর্মে ভাবনায়। তাই এখানে স্পষ্টত উপন্যাসের লক্ষণ উপায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বহুলখ্যাত 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর' গ্রন্থে আরণ্যক সম্বন্ধে বলেছেন "আরণ্যক উপন্যাস। অবশ্যই উপন্যাস। এই কারণে 'আরণ্যক' উপন্যাস যে, এখানে অরণ্যপট যত আমাদের অভিভূত করুক লেখকের লক্ষ্য ছিল পটারিধৃত মানুষ। সে মানুষ আপন বাস্তবতা বশতই সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের মানুষ নয়। এ উপন্যাসে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ব্যক্তিগুলি সম্পর্করহিত। রাজু পাঁড়ে এবং যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী এবং কুস্তা এদের মধ্যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই। রাসবিহারী সিং বা ধাওতাল সাহু দুজনেই মহাজন হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে ট্রিপিক্যাল মিল কিছু নেই-দুজনে যেন দুটো দ্বীপের মানুষ। আসলে লবটুলিয়া বইহারের অরণ্যজীবনে এখনও কোনো সংগঠিত সমাজ নেই। কৃষি অর্থনীতির গ্রন্থি সূত্র সবে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সুতরাং কোনো প্রকার সমাজ সম্পর্ক বা সামাজিক দ্বন্দ্ব ভালো করে মূর্তি ধরার আগেই এ কাহিনি শেষ হয়েছে। তখনও পর্যন্ত মানুষগুলি যেন বিচ্ছিন্নভাবে অরণ্যভূমির দ্বারা অধিকৃত। অরণ্যই তাদের অদৃষ্ট। এর বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রতিবাদ নেই। ধীরে ধীরে লোকগুলির সম্পর্কহীনতার অবসান ঘটবে অরণ্যভূমির

অবসান ঘটলে। তার আগে পর্যন্ত এটাকে কোনো সামাজিক উপন্যাসের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। বিষয়টার মধ্যে অনন্যতা আছে ববলে এর কর্মও অনন্য যদি এটা মেনে নেওয়া যায়, তাহলে আরণ্যক উপন্যাসের উপন্যাস স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রশ্নই থাকে না।"৪

'আরণ্যক' উপন্যাসের মধ্যে উক্ত সমালোচনার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় আছে। যদিও সামাজিক উপন্যাস না বলে এটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। এক হিসাবে সব উপন্যাসই তো সামাজিক উপন্যাস। অরণ্যকেন্দ্রিক সমাজ ও সেই সমাজের বিভিন্ন মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অবশ্যই এই উপন্যাসে আছে। কিন্তু লোকাল কালার বা আঞ্চলিকতার রঙও এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। অরণ্যকেন্দ্রিক মানুষগুলো যতটা না সামাজিক তার চেয়েও বেশি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সেই কারণেই তো প্রত্যেক চরিত্র ও তাদের জীবনচর্চা আঞ্চলিক সূত্রে বাঁধা। স্থানীয় পরিচয়, খাওয়া দাওয়ার উল্লেখ নির্দিষ্ট ধর্মবোধ, দেবতা এগুলিতো আঞ্চলিকতারই বিষয়, লবটুলিয়া বইহারের অরণ্যে প্রতিপালিত চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত তো তেমন কোনো বড় সামাজিক পরিবর্তনের স্বাদ পায়নি, যেটুকু পেয়েছে তা মানবতার স্বাদ। অস্পৃশ্য গাঙ্গোতা কুস্তা কিংবা অসুস্থ গিরিধারীলাল, দোষাদ মেয়েরা এই সব সমাজের অবহেলিত নিম্নবর্গীয় মানুষগুলো মানবতার স্পর্শ পেয়েছে মাত্র। লেখক যে তার কর্তব্যপালনের মধ্যে চিরস্থায়ী কোনো পরিবর্তন করে আসতে পেরেছে তা তিনি মনে করেন না। তাই উপন্যাসের শেষে তাকে খেদ করে বলতে হয়- "বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাড়া ও লবটুলিয়ার অরণ্য প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের যে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মতো আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কেমন আছে কুত্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুতরিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত অরণ্যভূমিতে কী করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে।

আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে না আসামের চা বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও।

কতকাল তাহাদের আর খবর রাখিনা।"৫

যদি উপন্যাসটিতে বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত থাকত তাহলে এই সংশয় সত্যচরণের এল কেন? আসলে সমাজ পরিবর্তন অবশ্যই এই উপন্যাসে আছে, তবে তা আঞ্চলিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত হয়ে নয়। সেই কারণে উপন্যাসটি যেমন সমাজ নির্ভর উপন্যাস হিসাবেও মান্য করা যায় তেমনি আঞ্চলিক উপন্যাসের গুণবৈশিষ্ট্যগুলিও এখানে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। সেক্ষেত্রে এটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসেরও তালিকাভূক্ত করা অসঙ্গত হবে না। প্রকৃতির নিবিড় রূপের ঐশ্বর্য অন্যদিকে প্রকৃতির সন্তানদের অসহায় দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবন প্রকৃতির স্বরূপটিকে চিনিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপন্যাসটিকে আদ্যন্ত ধাত্রী হিসেবে ধারণ করে রেখেছে। প্রকৃতির কবিত্বময় রূপালেখ্য এখানে সমুন্নত বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতি রক্ষার দাবিটিও এই উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেদিক থেকে এটিকে আঞ্চলিক পরিবেশ মুখ্য সামাজিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। অধ্যাপক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন-'আরণ্যক (এপ্রিল, ১৯৩৯) উপন্যাসটি পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি, বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ এখানে গৌণ।' সুতরাং উপন্যাসটি যে প্রকৃতি মুখ্য উপন্যাস সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি উপন্যাসে মানব চরিত্রের গভীর মূল্যায়নও করা হয়েছে। তাই "এখানে অরণ্যের কথা আর মানুষের কথা এক হয়ে গিয়েছে।"৭(কালের প্রতিমা)।

'আরণ্যক' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অভিনব সৃষ্টি। কেবল বাংলা বা ভারতীয় কথা সাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই এ ধরনের উপন্যাস আর নেই। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় এক ভিন্নতর পথের সন্ধান দিয়েছিল। আরণ্যক সেই ভিন্নতর ধারারই অভিনব সৃষ্টি। আরণ্যক উপন্যাসের গঠন শৈলী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এটি গদ্যে লেখা প্রকৃতির কবিতা। প্রকৃতি ও মানুষের অচ্ছেদ্য নৈকট্য ও নিবিড়তা উপনিষদীয় সত্যে স্নাত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এখানে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য হলেও মানুষ এখানে কোনো মতেই গৌণ নয়।, কেননা প্রকৃতি যেমন সর্বব্যাপী তেমনি সেই প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির আদি সন্তানদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সত্যচরণের উপলব্ধির সূত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে বলেই আরণ্যক যথার্থ উপন্যাস হয়ে ওঠার যোগ্যতা লাভ করেছে।

উপন্যাসটি প্রকৃত অর্থে কোনো জটিল প্লটের উপন্যাস নয়। জটিল কোনো কাহিনি এর মধ্যে নেই। কিন্তু অনেকগুলি কাহিনি একটি কাহিনির সঙ্গে মিলে গেছে, এবং এই খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিকে একত্রিত করে একটি কোলাজ তৈরি করেছেন লেখক। উপন্যাসটির মূলকথা প্রকৃতি সৃষ্ট সভ্যতার ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে মানবসৃষ্ট সভ্যতার পত্তন। সেই কাজ করতে গিয়ে সত্যচরণ যে বহু বিচিত্র চরিত্রের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের জীবনচর্চা ও দ্বন্দ্বই উপন্যাসের কাহিনি সৃষ্টি করেছে। তাই উপন্যাসের মূল কাহিনি বলতে কোনো কাহিনি নেই। অরণ্য পরিবেশে চরিত্রের টানাপোড়েন ও স্বভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিছিন্ন ঘটনা একত্রে মিশে গিয়ে সত্যচরণের উপলব্ধিকে পূর্ণতা দিয়েছে। গনোরী, বনোয়ারী কুস্তা, মঞ্চী, নকছেদী, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, বনোয়ারী, ভানুমতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি কোনোভাবেই একটি বিশেষ কাহিনির ছবি নয়। প্রত্যেক চরিত্রই স্বভাব স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কিন্তু এইসব চরিত্রগুলি লবটুলিয়া

বইহারের সুবিস্তৃত অরণ্য পরিবেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভানুমতী যেমন সাঁওতাল রাজকন্যা হয়েও অরণ্যের সঙ্গে একাত্ম। নাগরিক সভ্যতার লেশমাত্র তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার বিশ্বাস, তার চেতনা সবকিছুই আবর্তিত হয়েছে অরণ্যের নিবিড়তায়। কুন্তাও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির মধ্যেই বেঁচে থাকার আশ্রয় পায়। একঝুড়ি পাকাকুল কিংবা বাথুয়া শাক সিদ্ধই শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখে। তারা প্রত্যেকেই প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন সত্তায় মিশে যায়। আসলে সত্যচরণ নয় এইসব আরণ্যক পরিবেশের আদি সন্তানদের আসল ভাগ্য নির্ধারিত হয় লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতির দ্বারা।

উপন্যাসটি সর্বমোট আঠারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ আবার কতকগুলি খণ্ডাংশে বিভক্ত হয়েছে। এই খণ্ডাংশগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটি চিত্র। কোথাও কোথাও অনেকগুলি খণ্ডেই একটি কাহিনি আছে। এই খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি সবগুলিরই নিরবচ্ছিন্ন দ্রষ্টা ও কথক সত্যচরণ। তিনিই এই খণ্ড খণ্ড কাহিনিচিত্রগুলি একত্রে গ্রন্থিত করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের কাহিনি সৃষ্টি করেছে। সত্যচরণের আরণ্যক পরিবেশে নবাগত উপলব্ধিতে উপন্যাসটির সূচনা হলেও ক্রমেই অরণ্য প্রেম তাকে পেয়ে বসে। সে অরণ্য ও অরণ্যের আদি সন্তানদের গভীর মেদুর ভালোবাসায় আপন আত্মার আত্মীয় করে তোলেন। জমির ইজারা বিলি করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও উগ্র রূপ, শুনেছেন অলৌকিক পরীর গল্প, আত্মস্থ করেছেন মানুষের জীবনচর্চা, সঞ্চয় করেছে অভিজ্ঞতা, মনে চলেছে অনাবিল দ্বন্দ্ব আর এগুলিই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে কল্লোলীয় সবাই চেয়েছিলেন সমাজের অত্যাচারিত, অনালোকিত চরিত্রের স্বাভাবিক সত্যকে সাহিত্যে আলোচিত করা। কিন্তু আদিম অরণ্য প্রকৃতির অনালোচিত, অনালোকিত নিম্নবর্গীয় মানুষের কথা বাংলা সাহিত্যে আরণ্যকের মধ্যে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, আর অন্য কোথাও দেখিনি। সেই কারণে উপন্যাসটি বিচিত্র চরিত্রের চিত্রশালা হলেও এটি একটি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। যদিও আরণ্যক উপন্যাসের গঠনগত ত্রুটিও বর্তমান। অনেকেই গ্রন্থটির পরস্পরাহীন কাহিনির শিথিল বিন্যাসকে আরণ্যক উপন্যাসের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় বলে মনে করেন। বাস্তবিকই, সাধারণ উপন্যাসের দ্বন্দ্ব এখানে তেমন ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষের গভীর ঐক্য এখানে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। যা শিথিল বিচ্ছিন্ন ঘটনাক্রম একত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করে উপন্যাসের গঠনশৈলীর ভিন্নতর স্বাদ এনে দিয়েছে।

আরণ্যক উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা কবিতার অনুসারী। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে প্রকৃতির এক চরম রোমান্টিকতা পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সেইজন্য উপন্যাসের ভাষাশৈলী রোমান্টিক কবির কবিতায় পরিণত হয়েছে।"এখানে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। যতদূর চোখ যায়। এসব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ, আমার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ-মুক্ত আকাশতলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর দিগন্তের সীমারেখা পর্যন্ত মনকেও কল্পনায় প্রসারিত করিয়া দিই।"

এই অংশটি কী কোনো বাস্তববাদী উপন্যাসিকের না আদর্শবাদী দার্শনিকের? না কোনোটাই নয়, এই উপলব্ধি একজন প্রকৃতিমুগ্ধ রোমান্টিক কবির যিনি নির্জনতা পছন্দ করেন। একান্তে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এখানে সমকালীন কবি জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতিপ্রেম, রোমান্টিকতা, নির্জনতার কথা স্মরণে আসে। উপরোক্ত অংশটি পঙক্তিতে সজ্জিত করলেই তা একটি পূর্ণমাত্রায় রোমান্টিক প্রকৃতির আধুনিক কবিতায় রূপ পেতে পারে।

-এখানে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতেছি,
এমনটি আর কোথাও দেখি নাই।
যতদূর চোখ যায়
এসব যেন আমার,
আমি এখানে একমাত্র মানুষ
আমার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ-
মুক্ত আকাশে তলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর দিগন্তের সীমারেখা পর্যন্ত
মনকেও কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া দিই।

জীবনানন্দের "বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর", অংশের সঙ্গে প্রথম অংশটির কী অদ্ভুত সাদৃশ্য জীবনানন্দ দাশের নির্জনতার কথাও এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য সত্যচরণ তাকে একমাত্র মানুষ বলেছেন। কেননা সমগ্র উপন্যাসে তিনি লবটুলিয়া বাইহারের প্রকৃতির সঙ্গে ওই স্থানের সমস্ত মানুষের অভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন। এই অভিন্ন প্রকৃতির নির্জনে বসে তার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন আকুল প্রয়াসে। তাই তিনি একমাত্র মানুষ। এ ধরনের ভাষা ও ছন্দের কবিতা গদ্যের ছাঁদে কী অপূর্বতা সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য।

উপন্যাসটির মধ্যে তিনি সাধু ভাষাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই সাধুভাষা সাবলীল ও প্রবাহমান। এই ভাষা উপন্যাসের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় না।

উপন্যাসটি আদি মধ্য অন্ত্য সমন্বিত হলেও উপন্যাসটিতে উত্থান পতন শীর্ষবিন্দু স্পষ্ট নয়। সূচনা হয়েছে সত্যচরণের লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গল পরিবেশে কর্মসূত্রে আগমন দিয়ে আর সমাপ্তি ঘটেছে অত্রস্থান থেকে চিরবিদায় নিয়ে কলকাতার ব্যস্ত নাগরিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। কিন্তু উপন্যাসের শীর্ষবিন্দু কোথায়? আমাদের মনে হয় যে অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে সত্যচরণের গভীর প্রেম সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল, সেই প্রেমকে নিজের হাতেই ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসার জন্য প্রস্তুতি নেয় তখন প্রেমের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ জেগে ওঠে। আর এটিই উপন্যাসের শীর্ষবিন্দু বলে মনে হয়। তারপর ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা স্মৃতিপটে মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে অতীত স্মৃতিচারণার সূত্র ধরেই এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। আসলে "আরণ্যকের মূল শক্তি তার ভাষা ভঙ্গিমায় এবং বর্ণনা রীতিতে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু এ শক্তির উৎস নিঃসন্দেহে লেখকের সমগ্র চেতনার বিন্যাসে। নাড়া ও লবটুলিয়ার অরণ্য ভূমিতে যে বিস্ময় তা একদিকে যেন আ-নীহারিকা-তৃণকণা বিস্তৃত জীবনের বিস্ময়, তেমনি লেখকের স্বদেশ জীবনের স্বদেশজীবনের অন্তর্গত মানুষের জীবনধারণের বিস্ময়ও বটে। এই ছুটি ব্যাপারকে, তথা জীবনের দ্বৈত রূপকে লেখক শিলাস্থ করেছেন।"

'আরণ্যক' উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-"প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির এক অনিন্দ্যসুন্দর কাব্যাশৈলীর নির্দশন এই আরণ্যক উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত রচনাতেই প্রকৃতির এক সুমহান স্থান রচিত হয়েছে। "বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম, নিসর্গমুখিতা, সরল সত্যের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য আকস্মিক নয়, শিল্পগত ও জীবনগত।"১" প্রকৃতই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি প্রিয়তা যেমন তা শিল্পগত মননের অনুগামী তেমনি। এই প্রকৃতি চেতনা জীবনের কর্মতৎপরতার মধ্য থেকে অর্জন করা। আরণ্য উপন্যাসে সত্যচরণ কলকাতার নাগরিক পরিবেশ থেকে কর্মোপলক্ষে বিহারের লবটুলিয়া বইহারের নির্জন সুবিশাল অরণ্যে এসে, সেই দুই ধরনের অভিজ্ঞতা মুখ্যত অর্জন করেছিলেন। প্রথমত, তিনি প্রকৃতির নিসর্গ সৌন্দর্য এত গভীর ও নিবিড় করে দেখার সুযোগ লাভ করেছিল। ফলে তিনি প্রকৃতিতে একদিকে যেমন সৃষ্টির অপার ঐশ্বর্যের বাণীবাহক হয়ে দেখা দিয়েছে তেমনি অরণ্যের ধ্বংসাত্মক রূদ্রমূর্তিও অবলোকন করেছেন। পেয়েছেন প্রকৃতির এক সম্পূর্ণ চিত্র। দ্বিতীয়ত প্রকৃতিকে দর্শন করতে গিয়ে প্রকৃতির সন্তানদের এত নিকট থেকে দর্শন করায় তার বিপুল অভিজ্ঞতা ও অরণ্য মানবদের নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তাই বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রভৃতি কেবল অরণ্য নয় অরণ্য অধ্যুষিত মানব সম্পদও হয়ে উঠেছে প্রকৃতির অভিন্ন রূপ। সে কারণে 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রকৃতি আলোচনা করতে গেলে তা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের মিলিত আলোচনাতেই করা একান্ত আবশ্যক। পথের পাঁচালির অপুর প্রকৃতি দর্শন আর 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণের প্রকৃতি দর্শন এক নয়। পথের পাঁচালির অপু প্রকৃতিতে দেখেছিলেন তার চলমান জীবনের একটি অংশ হিসেবে। কিন্তু সত্যচরণ প্রকৃতিকে দেখেছেন সমগ্র চেতনা দিয়ে। তাই আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি চলমান সজীব চরিত্র, সেই প্রকৃতি সমস্ত চরিত্রের এমনকী সত্যচরণেরও ভাগ্য নিয়ন্তা। তাই প্রকৃতির গিরি গুহা, গাছগাছালি সরস্বতীকুণ্ড যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্যের অভাবনীয় ঐশ্বর্য মেলে ধরেছে তেমনি কুস্তা, মঞ্চী, বনোয়ারী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী সবই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াসূত্রে প্রকৃতিরই এক অভিন্ন সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন- "অরণ্য ধ্বংস করে বসতি স্থাপন, অরণ্যকে বিনষ্ট করার নির্মম অথচ আবশ্যকীয় কাজে লিপ্ত হয়েছে উপন্যাসের প্রবক্তা। আধুনিক সভ্যতায় এই ধুংস থেকে পরিত্রাণ নেই। আরণ্যক বাহ্যত এরই কাহিনী। অন্তরে এক অসাধারণ প্রকৃতি অভিজ্ঞতার বিবরণ। এই উপন্যাস আমাদের উপন্যাস সংস্কারকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এখানে অরণ্যের কথা আর মানুষের কথা এক হয়ে গিয়েছে।" প্রকৃতি ও মানুষের এই ঐক্যই আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ কাঠাকো নির্মাণ করেছে।আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতি বিভূতিভূষণের আত্মনিষ্ঠ ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে। রোমান্টিক কবির অনুরাগ ও প্রকৃতি প্রীতির সিগ্ধতা এখানে অভাবনীয় ঐশ্বর্যে প্রকাশ পেয়েছে।

১) "সবুজ বণশীর্ষ আমার পায়ের তলায়, আকাশ যেন আমার মাথায় ঠেকিয়াছে দূর দূর-দিগন্তের নীল শৈলমালার রেখা বনভূমিকে ঘিরিয়া যেন মায়ালোক রচনা করিয়াছে-আমি সে মায়ালোকের অধিবাসী বহু দূর স্বর্গের দেবতা। গত মেঘের তলায় তলায় পৃথিবীর কত শ্যামল বনভূমির উপকার নীল বায়ুমন্ডল ভেদ করিয়া যেন আমার অদৃশ্য যাতায়াত। " (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

২) "দরজা খুলিয়া বাইরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই... নিঃশব্দ অরণ্যভূমি নিস্তব্ধ জনহীন নিশিথ রাত্রি সে জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটোখাটো বন-ঝাউ ও কাশবন-তাহাও তেমন ছায়া হয় না। চকচকে

সাদা বালি মেশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুদ্ধ কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন কেটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব-মন হু হু করিয়া ওঠে। চারিদিকে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরিরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি-মানুষের কোনো নিয়ম এখানে খাটিবে না। এইসব জনহীন স্থান গভীররাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরিদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়, আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভালো করি নাই।"** (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

দুটি অংশ পাঠ করলেই বোঝা যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টিই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ রোমান্টিক গীতি কবির প্রকৃতি চেতনা এখানে স্পষ্টতই খুঁজে পাওয়া যায়। এই সব সৌন্দর্য দর্শনে যেমন- অতীন্দ্রিয়তা আছে তেমনি শিশুর আগ্রহ ও কৌতূহল মিশে আছে। আবার সবকিছু একাত্ম হয়ে গেছে সৌন্দর্যের গভীরতায়। সমালোচক এই কারণেই মন্তব্য করেছেন- "প্রকৃতির সমস্ত রূপচিত্রই বিভূতিভূষণের আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত। তাঁর সে দৃষ্টি কিশোর বালকের সরল শান্ত মুগ্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে শিশুর অবাক বিস্ময়ের রোমান্টিক স্বপ্নাবেশ।"" সে জন্যই- "এই দৃষ্টির স্পর্শে তাঁর আরণ্যক-এর পার্বত্য সৌন্দর্য কোথাও ভীম ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেনি। তা রূপকথার কোমল মধুর আলোয় স্নিগ্ধসুন্দর। সরস্বতী কুণ্ডীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যে মন্তব্য করেছেন, সমগ্র আরণ্যক-এর নিসর্গ পরিবেশ সম্পর্কেই লেখকের মনোভাব হিসাবে তা প্রযোজ্য: 'সরস্বতী কুণ্ডী... সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে।"

আসলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি স্নিগ্ধ সরলতা 'আরণ্যক' উপন্যাসের মানব চরিত্রগুলিকেও প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রীতি অনেক স্থলে W. H. Hudson এর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনা সম্পূর্ণ রূপে পৃথক, কেননা হাডসন উপন্যাসে প্রকৃতির বহিরাঙ্গিক রূপকে দেখানোর প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকের প্রকৃতি কেবল বহিরাঙ্গিক নয়। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ এবং উপন্যাসের সার্থকায়নে অত্যন্ত নিবিড় নৈকট্য স্থাপন করেছে। এ জন্য আরণ্যকের প্রকৃতি কেবল প্রকৃতির টুকরো ছবি নয়। প্রকৃতির টুকরো টুকরো ছবিগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ও ইঙ্গিতবহ। উপন্যাসের মানবচরিত্রের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্যভাবে মিশে গেছে। প্রকৃতি ও মানুষ একাত্ম হয়ে গেছে। প্রকৃতির এই উচ্চমার্গের কবিতাস্পর্শী রোমান্টিকতা বিভূতিভূষণের সৃষ্টিরহস্যভেদী কবিসত্তাকে বিকশিত করে। প্রকৃতির ছায়ায় তিনি সমগ্রতার বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারেন। এক অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে তিনি নির্দ্বিধায় যাতায়াত করতে পারেন। আবার মুহূর্তেই তিনি মঞ্চী, ধাতুরিয়া, কুস্তা, প্রভৃতি চরিত্রের অঙ্কনে তার বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের দারিদ্র, অসহায়তা, সবই প্রকৃতির মুগ্ধতার মধ্যেও বাস্তবতার স্পর্শ পেয়েছে। প্রকৃতির যেমন নৈসর্গিক নির্বিকল্প সৌন্দর্য আছে তেমনি প্রকৃতির এক চরম বাস্তবতাও আছে। বিভূতিভূষণ জানতেন প্রকৃতির সেই বাস্তবতা সকলের কাছে সহ্য করা সম্ভব নয়-"এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনো তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন দেশ বিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চ দরের নীর সংগীত-নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায় ঝিল্লির তানে ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয় সঙ্গতি। সে রূপ তাহার না দেখাই ভালো যাহাকে ঘর দুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে।' সেইজন্যই তিনি প্রকৃতির কঠিন কঠোর বাস্তবকে সেভাবে আরণ্যক উপন্যাসেও দেখাতে চাননি। তথাপি বিভূতিভূষণের মধ্যে Cosmic Imagination এত দৃঢ়ভাবে প্রবহমান যে তিনি প্রকৃতির কেবল চিত্র আঁকেননি প্রকৃতির গভীরতম সৌন্দর্যের সামগ্রিকতাকেও পরিবেশন করেছেন। প্রকৃতি রক্ষা, পরিবেশ চেতনা এই উপন্যাসে প্রকৃতি চেতনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সমালোচক এ কারণেই বলেছেন-"সত্যচরণকে নিজের সঙ্গে গোপনে লড়াই করতে হয়েছে, দুঃখ পেতে হয়েছে জঙ্গল মহলের জঙ্গল ধ্বংস করতে। সে অনেক দেরী করলেও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেননি। সেটা তার ক্ষমতা ও স্বভাবের বাইরে। কিন্তু তার হৃদয়দীর্ণ এই ক্ষমা প্রার্থনায় রবীন্দ্র উচ্চারণের সামান্য পাওয়া যায়, 'হে অরণ্যানির আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়, বিদায়!" অরণ্য পরিবেশ রক্ষার এই সচেতনা উপন্যাসটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে। আরণ্যক উপন্যাসের প্রকৃতি চেতনায় উপনিষদীয় আরণ্যক রূপ ও ভাবেরও প্রকাশ ঘটেছে অনেক স্থলেই। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন "দৃশ্যের পরে দৃশ্য একদিকে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অপরদিকে অতীন্দ্রীয় অনুভুতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যান তন্ময়তায় মগ্ন করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনি বাংলা উপন্যাসে ত নাই-ই; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।"

'আরণ্যক' উপন্যাসের নামকরণ কাহিনী ও বক্তব্য বিষয়কে যথার্থভাবেই প্রকাশ করতে সক্ষম। উপনিষদকে আরণ্যক শাস্ত্র বলা হয়। আরণ্যক শব্দের অর্থ- “be-longing to the wilderness"। আরণ্যক উপন্যাসেও আছে এই তত্ত্ব। আরণ্যক উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিই আবর্তিত হয়েছে আরণ্যক পরিবেশে। কলিকাতা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক চাকুরির কর্তব্য পালনের জন্য বিহারের লবটুলিয়া বইহারের বিস্তৃত অরণ্যে দিনযাপন

করতে গিয়ে প্রকৃতি ও মানব সমাজের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারই একটি বিচ্ছিন্ন অথচ ধারাবাহিক রূপ ধরা পড়েছে এই উপন্যাসের মধ্যে। প্রকৃতির অপরূপ রূপ এখানে এক সমুন্নত মাত্রা লাভ করেছে। প্রকৃতি এখানে একটি জীবন্ত চরিত্র। সে সত্যচরণের প্রেমিক। তার প্রতি সত্যচরণের ভালোবাসার কোনো অন্ত নেই। অমলিন, স্নিগ্ধ, ভাববিভোর ভালোবাসার মাধুর্যময় রূপ বৈশিষ্ট্য এখানে অপূর্ব কাব্যিক রোমান্টিকতার রক্তিম স্পর্শে মেদুরতা লাভ করেছে। কিন্তু সেই প্রেমিকার প্রেমকেও অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছে কর্তব্যের খাতিরে। মনের সমর্থন না থাকলেও এই সুদূর লীন অরণ্য প্রান্তরকে সে কর্তন করেছে বসতি স্থাপনের জন্য। ধ্বংস করেছে প্রেমিকার সৌন্দর্য। কিন্তু এ নিয়ে সত্যচরণের খেদও আছে। যে প্রকৃতির ভালোবাসায় তিনি প্রীতিস্নিগ্ধ সেই অরণ্যের অঙ্গচ্ছেদ তাকে ব্যথিত করেছে। আবার প্রকৃতির ভালোবাসার সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত আদি সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ ভালোবাসার স্পন্দন আবেগের মধুরতা তাকে আনন্দ দান করেছিল। তাদের মুখে হাসিও সত্যচরণকে আনন্দ জোগাত। প্রকৃতির বিচিত্র বৈভবের মধ্যে দারিদ্র লাঞ্ছিত অসহায় মানুষের জীবন জীবিকার যে ক্ষীণ আশা আকাঙ্খার যে ক্ষুদ্র পরিসর, অরণ্যের মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তা আরণ্যক উপন্যাসের বাস্তবতার দিকটি আমাদের প্রকাশ করে।

কেননা-"এখানে মানব মনের যে উদ্দাম চাঞ্চল্য, সে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, সে আকাশস্পর্শী পক্ষ বিস্তার করে নাই। নির্জন আত্মসমাহিত শান্তি, সমস্ত বাহুল্য আয়োজন সম্ভারের বর্জন, আকাঙ্খা পরিধির নির্মম সংকোচ এখানকার জীবনবৃত্তির বৈশিষ্ট্য।" অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা প্রতিপন্ন হয়েছে এই উপন্যাসে। এইসব মানব সম্পদকে প্রকৃতি তথা অরণ্য থেকে বিচ্যুত করা যায় না। এক সময় সত্যচরণও হয়ে উঠেছে অরণ্যের ভালোবাসায় মুগ্ধ। প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য তাঁর কাছে সভ্য জগতের ভালোলাগাকে অতিক্রম করে এগিয়ে আসে। কলিকাতার কর্মব্যস্ত পরিবেশও তাকে আকর্ষণ করে না। সে প্রকৃতির রূপের নির্জনতার মানেই খুঁজে পায় অপার ভালোবাসা অপেক্ষিত শান্তি, আকাঙ্খিত আনন্দ। কর্মের গতানুগতিকতা থেকে সত্যচরণ বের হতে পারেনি বটে, প্রকৃতির ভালোবাসায় তার আত্মিক বিলয় ঘটেছে। নির্বিকার দ্রষ্টা হয়েও সে প্রকৃতির রূপানুরাগে 'আরণ্যক' প্রীতিকেই মর্যাদা দিয়েছে- "চারিধারের বাধা বন্ধন শূন্য প্রকৃতি আমাকেও ক্রমে ক্রমে যেন ওই জয়পাল কুমারের মতো নির্বিকার উদাসীন ও নিস্পৃহ করিয়া তুলিয়াছে। শুধু তাই নয়, আমার যে চোখ কখনও এর আগে ফুটে নাই সে চোখ যেন ফুচিয়াছে সে সব কথা কখনও ভাবি নাই। তাহাই ভাবাইতেছে। ফলে এই মুক্ত প্রান্তর ও ঘনশ্যাম অরণ্য প্রকৃতিকে এত ভলোবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, একদিন পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের শহরে কার্য উপলক্ষে গেলে মন উড়ু উড়ু করে, মন টিকিতে চায় না। মনে হয়, কতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া যাইব, কতক্ষণে আবার সেই ঘন নির্জনতার মধ্যে অপূর্ব জ্যোৎস্নার মধ্যে সূর্যাস্তের মধ্যে দিগন্তব্যাপী কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে তারাভরা নিদাঘ নিশীথের মধ্যে ডুব দিব। ফিরিবার সময় সভ্য লোকালয়কে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া, মুকুন্দি চাকলাদারের হাতের বাবলা কাঠের খুঁটির পাশ কাটাইয়া যখন নিজের জঙ্গলের সীমায় ঢুকি, তখন সুদুর বিসর্পী নিবিড় শ্যাম বনানী, প্রান্তর, শিলাস্তূপ, বনটিয়ার ঝাঁক, নীল গাইয়ের ডেরা, সূর্যালোক, ধরনীর মুক্ত প্রসার, আমার একেবারে এক মুহূর্তে অভিভূত করিয়া দেয়।" (৪র্থ পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ সত্যচরণ প্রকৃতির ভালোলাগায় কেবল মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়।

প্রকৃতির নির্জনতার মধ্যে থাকার তথা ফিরে যাবার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দকে খুঁজে পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবনা উপনিষদীয় আরণ্যক ভাবনায় স্নাত। এই কারণেই লবটুলিয়া বইহারের অধিবাসীবৃন্দ শহরের নাগপাশ থেকে সর্বদাই দূরে থাকতে চেয়েছে। প্রবাসী বাঙালি গোষ্ঠবাবুও বর্ধমান জেলার বনপাশ থেকে এসে অরণ্যকে ভালোবেসে অরণ্যের অধিবাসী হয়ে উঠেছিল অরণ্য প্রীতি ও মুগ্ধতার কারণেই। "প্রথমে এসে বড় কষ্ট হত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত। আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দুদিনের বেশি তিনদিন থাকিতে পারি নে।" সত্যচরণেরও এই বোধে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগেনি- "দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এই নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর ছড়ানো বন ঝাউয়ের জঙ্গলের কী আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না-আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলকাতার গোলমনের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।" (৩য়) এভাবেই দেখা যায় সত্যচরণের গভীর প্রেম তাকে আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে একাত্ম করেছে আবার তা নিজ হাতে তাকে ধ্বংস করার মধ্যে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়েছে। গ্রন্থের শেষে তাই তাঁকে বলতে বাধ্য করেছেন অনুতপ্ত আত্মবিশ্লেষণে- "হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা ক্ষমা করিও আমায়।"

অর্থাৎ আরণ্যক উপন্যাসে লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতি তথা আরণ্যক পরিবেশেই মুখ্য পরিচালক। সত্যচরণও সেই পরিবেশের একজন হয়ে উঠেছে। মানব চরিত্রগুলি এখানে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। সমালোচক যথার্থই বলেছেন- "এই আরণ্য রাজসভার সভাসদগুলি নামে ও কার্যে, ব্যবহারে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রতিবেশের সহিত এক সুরে বাঁধা-উদার, অনাসক্ত নিস্পৃহতার ভাবমণ্ডলবেষ্টিত। কবি বেঙ্গটেশ্বর, অধ্যাপক মটুকনাথ, উদ্ভিদ বিদ্যাবিদ, সৌন্দর্যপিয়াসী যুগলপ্রসাদ, সাঁওতাল রাজ দোবরু পান্না ও তাহার প্রপৌত্রী নিজ সরল পবিত্র হৃদয়ের খাঁটি আভিজাত্যে গৌরবময়ী তরুণী ভানুমতী,

স্বভাবসিল্পী নিত্যবিশা ধাতুরিয়া সকলের উপরেই আরণ্য মহিমার রাজছত্র প্রসারিত। অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত প্রজাসাধারণও রাজু পাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুস্তা, রাজপুতানী, গলোরী তেওয়ারী, নকছেদী তুলসী মঞ্চী গিরিধারীলাল প্রভৃতি বনস্পতির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঝোপ জঙ্গলের এই অরণ্য পরিমণ্ডলের সহিত চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে।

এমন কী বাঙালি ডাক্তার, রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রী, বিহার প্রবাসী দরিদ্র বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিত যুবতী কন্যা ধ্রুবা, জবা-ইহারাও বাঙালি সমাজের বহু শতাব্দীর সাধনালব্ধ সংস্কার হারাইয়া এই অরণ্য সমাজের আভিজাত্য গৌরবহীন শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছে। সরস্বতী কুণ্ডীর অপরূপ সৌন্দর্যপূর্ণ বনস্থলীর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায় বাহাদুরের সপরিবারে বনভোজন বিলাল অমৃতহ্রদে মক্ষিকা নিমজ্জনের মতো, ইহার বিসদৃশ অসংগতির দ্বারাই, অরণ্য প্রকৃতির সুগম্ভীর, অধয্য মহিমাকে স্ফূর্তির করিয়াছে।"*° সেই কারণে আরণ্যক নামটি যথার্থ ও উপন্যাসের ঘটনাবলীর সঙ্গে একাত্ম ও সার্থক।

আরণ্যক উপন্যাসের কথক নায়ক সত্যচরণ হলেও নায়িকা চরিত্রের কোনো যথার্থ ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ভানুমতীর প্রেমে সাময়িকভাবে সত্যচরণ বিভোর মুগ্ধতা দেখালেও কিন্তু ভানুমতী নয়, সত্যচরণের প্রকৃত প্রেমিকা নিঃসন্দেহে লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতি। তাই সত্যচরণের প্রকৃত প্রেম সেই। সত্যচরণের মনে ভানুমতী প্রতি প্রেমের যে উদয় হয়েছে সে প্রেমও প্রকৃতপক্ষে তাঁর অরণ্যপ্রেমের একটি পর্যায় মাত্র। কেননা ভানুমতি আসলে আরণ্যক সত্তার সঙ্গে একীভূত। সে লবটুলিয়া বইহারের সৌন্দর্যমণ্ডিত মধুর শোভামণ্ডলের একটি শোভা। অরণ্য পরিবেশে প্রকৃতি যেমন রাজকন্যা হয়ে রয়েছে তেমনি ভানুমতীর কোনো বিলাস বৈভব না থাকলেও সে প্রকৃতই রাজকন্যা হয়েছে সত্যচরণের ভাবনায়। 'মানি বা নাই মানি ভানুমতী রাজকন্যা' সুতরাং প্রকৃতির রাজপরিবেশে তিনি প্রকৃতির রাজকন্যা। তাই ভানুমতী আসলে প্রকৃতিরই জীবন্ত রূপ। সত্যচরণের প্রকৃতি প্রেমই তাকে লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতিতে আত্মার আত্মীয় করে তুলেছিল। কলিকাতার নাগরিক পরিমণ্ডল থেকে অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে কর্মসূত্রে এসে তাকে ভালোবেসে তার মধ্যে ভালোলাগার রূপমুগ্ধ তন্ময়তা খুঁজে পেয়েছেন সেই কারণে অল্প দিনের মধ্যেই সে অরণ্যনের গভীরতম ভালোবাসায় আকর্ষিত হয়েছে। তাঁর ভালোবাসায় খুঁজে পেয়েছে নির্জনতা, শান্তি, মুগ্ধতা। প্রেমের গভীরতা তাকে অতীন্দ্রিয় ভাব বিভোরতায় মুগ্ধ করেছে। কিন্তু যে কার্যের জন্য তিনি লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলে এসেছিলেন প্রজাদের মধ্যে জঙ্গলের জমি বিলি করা, তা করতে গিয়ে একসময় তার প্রেমিকার অনেক সৌন্দর্য্যকে বলি দিয়েছিলেন। তার জন্য তার খেদ নেই এমন নয়, সে কারণেই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন অরণ্যের আদিম দেবতাদের কাছে। ফলে তিনি তার প্রেমকে নিজের হাতে নষ্ট করেছেন জেনেও তার পক্ষে সেই দুর্বার অমোঘ বিষয়টিকে রোধ করা সম্ভব হয়নি। আরণ্যক উপন্যাসে তার নিবিড় প্রেম আরণ্যক উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। অরণ্যের মানুষগুলি হয়ে উঠেছে অরণ্যের উপাদান তাই তার ভালোবাসা কেবল অরণ্য পরিবেশে নিসর্গ সত্তাকে নয় তাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি মানব চরিত্রগুলিও এসেছে অভিন্নতার সূত্রে। সমালোচক এই কারণেই বলতে চেয়েছেন-" দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, আরণ্যক উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক। দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক।" এই কারণেই "ভানুমতী অরণ্যের সমস্ত সৌন্দর্যকে এবং সারল্যকে নিজের মধ্যে অবলীলাক্রমে সংহত করেছে।" সত্যচরণও নিজে বলেছে-"এই অরণ্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করিয়া একি অপূর্ব সুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়ে গেছি।" এই বন্য নায়িকা যে ভানুমতীর সঙ্গে অভিন্ন তা স্পষ্টই বোঝা যায়।"

'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়ক কথক সত্যচরণ। সমগ্র উপন্যাসের পরিচালক সত্যচরণ কলিকাতার নাগরিক পরিবেশ থেকে কর্মসূত্রে বিহারের ভাগলপুরের লবটুলিয়া বইহারের অরণ্য পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়। প্রথম দিকে এই আরণ্যক পরিবেশ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলেও অচিরেই সে অরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। একাকীত্বের যন্ত্রণা মুহূর্তের বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতি তার কাছে হয়ে উঠেছে সবচেয়ে নিকটজন, আত্মার আত্মীয়। প্রকৃতির নিবিড় নৈকট্য আর অনিন্দ্য সুন্দর শোভা তাকে নির্বিকার উদাসীন 'নিস্পৃহ' করে তুলেছিল সুন্দরী প্রকৃতির সৌন্দয্যপ্রীতি তাকে করে তুলেছিল রূপমুগ্ধ ভাবতন্ময়। একদা না ভালোলাগা প্রকৃতির নির্জনতাই হয়ে ওঠে তার মানসিক শান্তির একমাত্র উপায়। প্রকৃতি ধীরে ধীরে সত্যচরণের প্রেমিকা প্রেয়সী হয়ে ওঠেন। সত্যচরণের নায়কত্ব সার্থক হয়ে ওঠে প্রকৃতি প্রেমের মধ্যে।

প্রজাদের মধ্যে জমি বিলি করতে এসে প্রজারাও তার কাছে হয়ে ওঠে প্রকৃতির এক রূপ। প্রকৃতি ও মানব চরিত্র একত্রে আত্মীকরণ হয়ে যায়, তার কাছে। মুনেশ্বর সিং রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী বনোয়ারী প্রভৃতি আরণ্যক চরিত্রদের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। সত্যচরণ তাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে। দিয়েছে অভিভাবকতুল্য বরাভয়। ভানুমতীর প্রেমে সত্যচরণ অভিভূত হলেও সে সেই প্রেমকে মর্যাদা দিতে পারেননি, কেননা বৃহৎ প্রকৃতির কাছে ভানুমতি একটি রূপমাত্র। তাই ভানুমতীও প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে যতদিন সত্যচরণ কাছে পেয়েছে প্রকৃতিও ততদিনই সত্যচরণের কাছে তার স্নিগ্ধতা, চপলতা দেখিয়েছে। উপন্যাসের শেষে কর্মবীর, সত্যচরণ তাই যখন চলে এসেছে প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রেমের

বিলয় ঘটেছে। ভানুমতীও থেকে গেছে প্রকৃতিরই একজন হয়ে। যে প্রকৃতিকে ভালোবেসেছে, তাকেই সত্যচরণ হত্যা করেছে নিজ হাতে। এটাই সত্যচরণের গভীর বেদনার বিষয়।

সত্যচরণ সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন-" সত্যচরণকে নিজেকে নিজের সঙ্গে গোপন লড়াই করতে হয়েছে। দুঃখ পেতে হয়েছে জঙ্গলমহলের জঙ্গল ধ্বংস করতে।" বিভূতিভূষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন-বিভূতিভূষণের বিশ্ব একটি সুবৃহৎ ও সুবিচিত্র খেলাঘর; তাহার অধিবাসীরা সকলেই বালক বালিকা। তাঁহার বিশ্বকর্মা নিজেই যেন বালক, খেলার সঙ্গী গড়িয়া খেলার শখ মিটাইয়া লইতেছেন- বিভূতিভূষণ নিজেও শেষ পর্যন্ত বালক ছিলেন। তাই জীবনের জটিল ও দুর্গম দিকটা তাহার চোখে পড়িত না, কিংবা পড়িলেও জটিলতার মর্ম বুঝিতে পারিতেন না, সমস্তকেই নিজের ছাঁচে স্মরণ করিয়া প্রকাশ করিতেন।" ২ প্রকৃতপক্ষে সত্যচরণের ক্ষেত্রেও এই কথা সার্থকভাবে প্রযোজ্য। বিভূতিভূষণের সারল্য ও শান্ত রূপটি সত্যচরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সেই কারণে সত্যচরণের চরিত্রে কোথাও কোনো কাঠিন্য নেই। গতানুগতির কর্মের মধ্যে দিয়ে সে এগিয়ে গেছে। প্রেমের আহ্বানও সে গ্রহণ করেছে, ভানুমতীর কাছ থেকে অস্পষ্ট থেকে গেছে তার ভূমিকা। কেবল জমিবিলি, অরণ্য চরিত্রদের সঙ্গে সরল গতানুগতিক আচরণ আর প্রকৃতি প্রিয়তা এই তিনটি ভূমিকাই তিনি পালন করেছেন কোমল ও সরলতার সঙ্গে। সেই কারণে সত্যচরণ যথার্থভাবে Active চরিত্র হয়ে ওঠার অবকাশ থাকলেও হয়ে ওঠেনি।

'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়িকা প্রকৃতি হলেও রক্তে মাংসে গড়া মানব চরিত্রে ভানুমতীকেও অনেকে নায়িকা বলে মনে করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভানুমতী এই উপন্যাসের নায়িকা হতে পারে না। কেননা সত্যচরণের সমগ্র কর্মজীবনে ভানুমতী আর পাঁচটি চরিত্রের মতোই তার জীবনে এসেছে। যদিও সত্যচরণের সঙ্গে ভানুমতী কিংবা তার পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হলেও এমনকী সত্যচরণ কিংবা ভানুমতী পরস্পরের প্রতি অস্পষ্ট প্রেমের উদয় হলেও সে সত্যচরণের সামগ্রিক কর্মজীবনের সঙ্গী হতে পারেনি এবং প্রকৃতির একটি রূপ হিসাবেই দেখানো হয়েছে। লবটুলিয়া বইহারের প্রকৃতি যেমন সত্যচরণের প্রেয়সী তেমনি ভানুমতীও সেই প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত। তাই সত্যচরণ প্রকৃতির ভালোবাসার মধ্যে ভানুমতীর ভালোবাসাকে দেখেছেন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে। তাই ক্ষণিকের প্রেমের উদয় হলেও তাই সক্রিয়ভাবে সেই প্রেমের অনুভবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কেবল নির্জনতা, প্রকৃতির রূপ দর্শন করেই সে আনন্দলাভকরেছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন- "ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক।" সেই জন্যই ভানুমতী আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে পৃথকভাবে সত্যচরণের কাছে দেখা দেয়নি।

আরণ্যক উপন্যাসের অন্যতম প্রবীণ চরিত্র রাজু পাঁড়ে এক অভিনব চরিত্র। তার চরিত্রের অনেকগুলি স্তর আছে। সে হত দরিদ্র, লাজুক পরোপকারী তেমনি কর্মপটু, ধর্মপ্রাণ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে বেশ পটু। রাজু পাঁড়ে অরণ্যের আর পাঁচটি চরিত্রের মতোই আবির্ভূত হলেও সমগ্র উপন্যাসে রাজুর ভূমিকা অনেক। সত্যচরণের সহযোগী হিসবে অনেক সময়ই তাকে দেখা গেছে। মানবতার প্রতি প্রেম, বিশ্বাস, সেবাপরায়ণা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি লবটুলিয়া বইহারের অন্যান্য চরিত্রগুলি থেকে পৃথক করেছ। তার মানবপ্রেম আসলে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপেরই একটি প্রকাশ। কেননা প্রকৃতি কেবল যেমন সৌন্দর্যময়ী নয়, সে ধাত্রীও। তার স্নেহ মমতা ভালোবাসাও আছে। তাই রাজু পাড়েও প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়।রাজু পাঁড়ে একদা যৌবনে প্রেমে পড়েছিল। গুরুর কন্যা সরযুকে প্রেম করে বিয়ে করেন। কিন্তু একসময় তার সেই স্ত্রী মারা যায়। রাজু পাঁড়ে ক্রমশ নির্জন ও আত্মস্থ হয়ে ওঠে। স্মৃতির ডালি নিয়ে বেঁচে থাকে রাজু। সত্যচরণের সঙ্গে রাজুর মিল এখানে। রাজু যা বাস্তবে করেছে সত্যচরণ সেটা উপলব্ধি করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সত্যচরণের প্রেমও এমন গভীর হয়ে উঠেছে যে প্রকৃতি তার প্রেয়সী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক সময় সেই প্রেমও হারিয়ে গেছে রাজুর স্ত্রী সরযূর মতোই। প্রকৃতির অকালমৃত্যু ঘটেছে তার এয়োতির সৌন্দর্য নিয়ে। রাজুর মনে যেমন কেবল স্মৃতি রোমন্থন আছে সত্যচরণের আছে সেই মধুর বেদনা স্মৃতি। কালের অমোঘ নিয়মে যেমন সরযূর মৃত্যু হয়েছে তেমনি লবটুলিয়া বইহারের প্রজাদের জমিবিলির জন্য প্রকৃতিকে নিজ হাতেই ধ্বংস করতে হয়েছে অনিবার্য নিয়মে। তাই মনে হয় সত্যচরণ আর রাজু পাঁড়ে পৃথক কেউ নয়, তারা উভয়ের একটি সত্তা। যে মানবতা নির্জনতা সেবাপরায়ণা, পরোপকার সত্যচরণের পাথেয় তাই তো রাজু পঁড়েকেও আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। রাজু পাঁড়ের কর্মতৎপরতাও সত্যচরণের কর্মতৎপরতার অনুগামী। আসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরলতা ও কোমলতা এবং মানবতার রূপগুলি তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে আরণ্য উপন্যাসেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। সমালোচক এই কারণেই তাঁর আদর্শ হিন্দু হোটেল সম্পর্কে বলেছেন- "তাঁর যে কোন উপন্যাসের মতো এটিও দৈনন্দিনের এক মালা। একদিনের ঘটনা ধারার ও মনোভাবের সঙ্গে অন্যদিকে কোন পার্থক্য নেই।"২০ বস্তুত এই পার্থক্যহীন কাহিনির গতানুগতিক পৌণপুনিকতার ছাপ থাকায় রাজু পাঁড়ে চরিত্রটিও শেষ পর্যন্ত সত্যচরণের স্বভাবের সঙ্গে মিশে যায়। তবে একটা জায়গায় উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ধরা দেয়। রাজু পাঁড়ে ধর্মভীরু ও আধ্যাত্মিক ভাবনায় মগ্ন কিন্তু সত্যচরণ কেবল প্রকৃতির রূপদর্শনে মুগ্ধ। মুগ্ধ তার বিচিত্র মানব চরিত্রদের নিয়ে। আধ্যাত্মিকতার শান্ত সমাহিত নির্জনতা সত্যচরণের মধ্যে দেখা গেলেও আধ্যাত্মিকতার প্রথাগত ভাবনা রাজু পাঁড়ের মতো তার মধ্যে দেখা যায়নি। কর্তব্য শেষে সত্যচরণ কলকাতায়

ফিরে এসেছেন আর কোনোদিন সে লবটুলিয়া বইহারের অরণ্যে ফিরে যায়নি। খোঁজ রাখেননি তার অতি পরিচিত আপনার প্রজাদের। এর জন্য তাঁর খেদ ছিল। ছিল বেদনার দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু সে কোনোদিনই সেখানে যেতে চাননি। সমগ্র জঙ্গলমহল 'উদাস' হয়ে যাবার পরও রাজু কিন্তু থেকে গেছে সেই জঙ্গলেই তার নাড়ীর টানে। আসলে সত্যচরণের দুটি রূপ। একটি সে নিজে, অন্যটি তার প্রকৃতি প্রীতি স্নিগ্ধ রাজু পাঁড়ে। কেননা সে শহরে ফিরে এসে তার সেই প্রীতি নগরের কলকোলাহলে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। হয়তো বজায় রাখতে চাননি। সেই কারণেই জঙ্গলমহলের আদি সন্তান রাজু পাঁড়েকে রেখে এসেছেন তার প্রতিনিধিত্ব করে তোলার জন্য যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে নয় জঙ্গ লের মধ্যে থেকে তার অস্তিত্বকে চিরকাল হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে। তাই সত্যচরণ যখন চিরকালের জন্য জঙ্গল ত্যাগ করে চলে আসে রাজু থেকে যায় তার অরণ্যের অধিকারে।

আরণ্যক উপন্যাসের বিচিত্র চরিত্র সমূহের মধ্যে নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া অনায়াসেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রকৃত শিল্পীর শিল্পপ্রেম, অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ, পরিশ্রম, ধ্যান সবগুলি গুণই তার ছিল। তাই অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত ধাতুরিয়া পরিশ্রম করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওস্তার ভীটল দাসের কাছে পৌঁছে যায় কেবল তার প্রিয় 'ছক্করবাজি' নাচ অধ্যয়ন করবে এই আশায়। সে তার ধ্যান ও অধ্যাবসায় তাকে নৃত্যশিল্পী করে তুলেছিল। কিন্তু গাঙ্গোতা প্রজাদের নাচ দেখিয়ে তার আশা পূরণ হয় না। তাই কলকাতায় সেই নাচ প্রদর্শন কতে চায়। গভীর অরণ্য পরিবেশের বাসিন্দা হয়েও তার এই আধুনিক মনন ও শিল্পীর সহনীয়তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তাই ধাতুরিয়া কেবল শিল্পী নয়, আধুনিক মননেরও অধিকারী।

কুন্তা আরণ্যক উপন্যাসের একটি বিশেষ নারী চরিত্র। প্রবল দারিদ্র অসহায়তা নিয়েই কুন্তা প্রকৃতির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। জন্মসূত্রে বাইজীর কন্যা, দেবী সিং রাজপুতের স্ত্রী মানবতার চরম শিখরে পৌঁছে গেছে তার সেবাপরায়ণতা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং পরোপকারের জন্য। তার প্রবল দারিদ্র্য আমাদের অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে। কিন্তু তার মানবতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। রাজপুতের স্ত্রী হয়েও জাত্যাভিমান ভুলে সে অসুস্থ নিম্নবর্গের গিরিধারীলালকে সেবা শুশ্রুষা করেছে, তাকে পিতার আসন দিয়েছে। এই সমুন্নত ব্যক্তিত্ব তাকে অসাধারণ করে তুলেছে। আসলে কুন্তা প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন। সত্যচরণ তাকে জমি দান করে তার দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টা করেছে। সত্যচরণের সংস্পর্শে এসে কুন্তা মানবতার শীর্ষে পৌঁছেছে। নারীত্বের অহংকার যেমন তার মধ্যে দেখা গেছে তেমনি গিরিধারীলালকে সেবা করার মধ্য দিয়ে মানবতার অলংকার তৈরি করেছে কুন্তা।

আরণ্যক উপন্যাসে যুগলপ্রসাদ চরিত্রটি বিভূতিভূষণের সৌন্দর্য ভাবনার একটি প্রতিচ্ছবি। যুগলপ্রসাদ অরণ্যকে এত বেশি ভালোবেসেছে যে তার সৌন্দর্যহীনতা সে সহ্য করতে পারে না। তাই নিজ চেষ্টায় সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য জঙ্গলে বিভিন্ন গাছপালা লাগিয়ে থাকে। অরণ্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তার অকৃপণ প্রচেষ্টাকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছে সত্যচরণ। উভয়ে একত্রে মিলে সেই চেষ্টাকে এক সুউচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। কোমলতা, সংসার বিমুখতা, অবৈষয়িক মনোভাব বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের বহু চরিত্রের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। যুগলপ্রসাদও অবৈষয়িক আত্মস্থ, সৌন্দর্য পিপাসু, ভাবতন্ময়, নির্জন মানুষ। আসলে যুদলপ্রসাদ বিভূতিভূষণের অভিন্ন সত্তা।

এই উপন্যাসে মঞ্চী, নকছেদী, রাখালবাবুর স্ত্রী মুনেশ্বর সিং প্রভৃতি চরিত্রগুলি কোথাও কোথাও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও তারা অরণ্যের এক অভিন্ন রূপ হিসাবেই প্রকাশ পেয়েছে। সমালোচক এই কারণেই বলেছেন- "অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত প্রজাসাধারণেরও রাজু পাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুন্তা রাজপুতানী, গনোরী তেওয়ারী নকদেদী, তুলসী মঞ্চী গিরিধারীলাল প্রভৃতি বনস্পতির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঝোপজঙ্গলের মতো-এই আরণ্য পরিমণ্ডলের সহিত চমৎকার মিশিয়াছে।"২৪

আরণ্যক উপন্যাসের তাৎপর্য যেমন সমাজ পরিবর্তনের দিশা দেখানোয় তেমনি আঞ্চলিকতার আন্তরিক ভাবনায়। লবটুলিয়া বইহারের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী অরণ্যের আদি সন্তানদের জীবনের মহাভাষ্য গভীরতর মূল্যায়নের ধরা পড়েছে। অরণ্য অঞ্চলের বিভিন্ন লৌকিক জাতি ও তাদের কিছু কিছু লোককথা, লোকাচার আরণ্যক উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে। নিঃসন্দেহে সামাজিক রূপরেখার বাস্তবতাকে স্পষ্টতর করে তোলার জন্য এই লোককথা লোকাচারের গুরুত্ব যেমন অসীম তেমনি আঞ্চলিকতার রঙও এসবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিক চেয়েছিলেন সমাজের রূপরেখাটি প্রকৃতি পরিবেশের প্রেক্ষাপটে রচনা করতে সেই কারণে অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন তাকে বিভোর করে তুলেছিল তেমনি প্রকৃতি সন্তানদের দৈনন্দিন সমাজ বাস্তবতাকেও তাদের জীবনযাত্রার প্রাত্যহিকতা থেকে গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই আরণ্যক উপন্যাসের লোকসংস্কৃতির ব্যবহারও চরিত্রের প্রাত্যহিকতার সূত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। যদিও বিভূতিভূষণ রূপমুগ্ধ রোমান্টিক, নির্জনতা ও শান্তরসের প্রবাহতার উপন্যাসে ধরা পড়ে। তথাপি তিনি সমাজনির্ভর উপন্যাসেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। আরণ্যক উপন্যাসে প্রকৃতির নির্জনতা ও সৌন্দর্যের উপভোগের সঙ্গেও সমাজ বাস্তবতা অবস্থান করেছেন।নন্দলাল ওঝার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন অতিথিকে অভ্যর্থনা করার নতুন রীতি। এই রীতি একান্ত ভাবেই উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়- "দশ-এগারো বছরের একটি ছোটো মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা খালা ধরিল-থালায়

গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটি মধুপর্কের মতো ছোটো বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর" এভাবে আপ্যায়ন করে অতিথিকে অভ্যর্থনা দেওয়ার মধ্যে তাদের লোকাচার ধরা পড়েছে।

লবটুলিয়া বইহারের লোকাচারের কথা বলতে গিয়ে সত্যচরণ দেখেছেন সেখানকার বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়ির কোন পরিচিতকে দেখলে তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। কেননা এরূপ আচরণের মধ্যে দিয়ে পিতৃগৃহের প্রতি টান প্রকাশ পায়। স্বামী গৃহে সুখে আছে এটা সেখানকার বিবাহিত মেয়েদের কাছে লজ্জার।-"আসলে ইহা আদর আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ির মানুষ দেখিয়া কাঁদে না-অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামীগৃহে বড়ো সুখেই আছে-মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়োই লজ্জার কথা।" লবটুলিয়া বইহারের যুবতী মেয়েদের সাজসজ্জার মধ্যেও আছে লোকসংস্কৃতির স্পর্শ। "তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপ ফুল গুঁজিয়া; কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনী আটকানো।" স্থানীয় খাদ্য তালিকা প্রকাশেও লোক সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে শুটকী, কুচো, চিংড়ি, লালসে পিঁপড়ের ডিম প্রভৃতি খাবারের উল্লেখ অরণ্যের আঞ্চলিকতার পরিচয় দান করেন। জঙ্গলমহলের অন্যতম প্রধান নাচ 'ছককর বাজি' আর 'ননীচোর নাটুয়া'র নৃত্য। এই দুটি নাচই কোন মূল ধারার নৃত্য নয়। এগুলি লোকনাচের পর্যায়ে পড়ে। ঔপন্যাসিক সেই গানের উল্লেখ তার সজ্জা, নাচের রীতি, এমনকী যে লোকগানের ব্যবহার হয়েছে ছককরবাজি নাচের মধ্যে সেগুলি যথাযথ নিষ্ঠাভাবে আলোচনা করেছে। পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতোই রোমান্টিক প্রেমের মেদুরতা ও বেদনায় মূর্ত হয়েছে এই ছককরবাজি গানের মধ্যে। লোকসংস্কারও লোকসংস্কৃতির মধ্যে আলোচিত হয়ে থাকে। আরণ্যকে পরীদের কথা তাদের ক্রিয়াকলাপ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা রূপকথার পর্যায়েই পড়ে। রূপকথা লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। এখানে ঔপন্যাসিক সেই রূপকথাকে ব্যবহার করে তাঁর লোকসংস্কৃতি চেতনাকে প্রকাশ করেছে। টাড়বারো প্রভৃতি লোকদেবতার পরিচয় দান করে তাঁর লোকসংস্কৃতি বোধকে আরও বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন।

1. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরণ্যক প্রস্তাবনা, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, চতুর্বিংশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ৩।
2. ঐ
3. ক্ষেত্রগুপ্ত; বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃষ্ঠা-২৮৮
4. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৬৪।
5. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ প্রথম প্রকাশ ১৩৮৩ বঙ্গ াব্দ, চতুর্বিংশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা-১৬৮।
6. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা-৬১৩
7. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং কোং পঞ্চম সংস্করণ-২০১০, পৃষ্ঠা-৬৬
8. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরণ্যক
9. সরোজ বন্দোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং কোং, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৭০।
10. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা-৬১৩।
11. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, বগলের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং কোং পঞ্চম সংস্করণ-২০১৩, পৃষ্ঠা-৬৬
12. ঐ
13. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক।
14. ঐ
15. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং কোং, প্রথম প্রকাশ, ১৪৮০ বঙ্গাব্দ, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২৯০
16. ঐ
17. ক্ষেত্রগুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, তয় সংস্করণ-২০১০, পৃষ্ঠা-২৮৯
18. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা-৬১৪।
19. ঐ
20. ঐ

21. সরোজ বন্দোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৭০।
22. প্রমথনাথ বিশী বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ- চৈত্র সংখ্যা, প্রকাশ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৬৬
23. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা-৬১৪।
24. ঐ